মাইজভাণ্ডারী সেমিনার- ৪

তারিখ:- ১৭/০৭/২০১২

স্থান ঃ- খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ)
৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-০৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ শিরোনাম

বেলায়ত ও ওলীর বেলায়তী বৈশিষ্ট্য

রচনা

শায়খ মুহাম্মদ মুহি উদ্দীন আযহারী

প্রধান, পোর্টস মাউথ ইসলামিক সেন্টার, ইউ.কে
খতিব, পোর্টস মাউথ জামে মসজিদ, ইউ.কে

আয়োজনে ঃ মাইজভাণ্ডারী ফাউণ্ডেশন

মুদ্রণ : মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

بسم الله الرحمن الرحيم

"নবীয়ে কামেলের নবুয়ত জ্যোতিঃ সাদৃশ এই বেলায়তে কামেলা বা পূর্ণতাকারী বেলায়ত জ্যোতিঃ খোদার প্রেম-প্রেরণা আলোতে তিমিরাচ্ছন্ন মানব-মননগহবরকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।"

"আউলিয়াগনকে কাশফ, ইলহাম, এলমে-লদুন্নী, ফরাছত বা সূক্ষ্ম উপলব্ধি, বিজদান বা হালজজবা প্রভৃতি প্রকৃত খোদায়ী শক্তি দ্বারা শক্তিশালী করা হয়।"

খাদেমুল ফোকারা হযরত সৈয়দ
দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহ:)

১. ভূমিকা:

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মাঝে একদলকে নির্দিষ্ট করেছেন। তারা তাকে ভালোবেসেছেন। তিনিও তাদেরকে ভালোবেসেছেন[১]। তারা বিশেষভাবে বিশেষায়িত একটি দল। কোরআনের পরিভাষায় এই দলকে ওলী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তাদের এই বিশেষ গুণকে বেলায়ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওলী আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নৈকট্য তথা বেলায়ত লাভের পর তার স্বত্ত্বায় এই বেলায়তের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বেলায়তের প্রভাবে ওলীর মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয় যা সাধারণ মুমিনের মাঝে দেখা যায় না। বেলায়তের প্রভাবে এই সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত বিধায় এসব গুনকে বেলায়তী বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ওলীর বেলায়ত লাভের ও তৎপরবর্তিতে বেলায়ত ধরে রাখার প্রথম সোপান ও শর্ত হচ্ছে তিনি ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হবেন। রাসুল (সঃ) এর চরিত্রই ইসলামী চরিত্র। সুতরাং একজন ওলী কোরান ও হাদীস শরীফের দিক নির্দেশনা পুরোপুরি মেনে চলবেন এবং সুন্নতে মোস্তফা (সঃ) এর অনুসরনে তার জীবন গড়ে তুলবেন।

সুন্নতে মোস্তফা (সঃ) এর অনুসরনে জীবন গড়লে আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এবং তাকে তার ভালবাসা দান করেন। ওলী আল্লাহকে ভালবাসেন; আল্লাহ তার ওলীকে ভালবাসেন। ভালবাসা বিনিময়ের এই মাকাম অর্জন বেলায়তের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। এই মাকামে ভালবাসার প্রতিদান একমাত্র ভালবাসাতেই হয়।

বেলায়তের অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাকে কারামত দান বা সম্মানিত করেন। ক্ষেত্র বিশেষে এই কারামত জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। আবার অনেক সময় লোকচক্ষুর আড়ালে লুকায়িত থাকে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনায় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক কিছুর জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

[১] আল্লাহ তাদেরকে ভালোবেসেছেন, তারাও তাকে (আল্লাহকে) ভালোবেসেছেন। মায়েদা: ৫৪ (يحبهم ويحبونه)

সাধারণত: এই সব নিয়ম এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনা।[২] তবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বন্ধুদের প্রয়োজনে তাদেরই হাতে প্রকৃতির নীতির বিপরীত কাজ সংঘটন করেন। যা আমাদের সাধারণ চোখে অলৌকিক ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়।

বেলায়ত লাভ করার পর ওলীর ক্বলব খোদায়ী তাজাল্লির দ্যুতি ধারনের যোগ্য হয়। এই স্বর্গীয় আলোতে ওলীর সামনে থেকে সকল পার্থিব আঁধার দূরিভূত হয়। তার সামনে খোদায়ী রহস্যের পর্দা উন্মোচিত হয়। তিনি কাশফ শক্তির অধিকারী হন। আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদেরকে পথের দিশা দেয়ার নিমিত্তে কখনও কখনও তাদের ইলহাম দান করেন। কোন প্রকার পার্থিব মাধ্যম ব্যতিত ওলীর অন্তরে যে জ্ঞানে উন্মেষ ঘটে সেটাই ইলহাম।

এই স্বর্গীয় নুরের ছটায় ওলীর চরিত্রে আরও একটি বেলায়তী বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার ক্বালবে এমন শক্তি দান করেন যাতে তিনি অন্য মানুষের অবস্থা ও তাদের আচার-আচরণের মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এই যোগ্যতাকে ফিরাছাত হিসেবে গন্য করা হয়। এছাড়াও বেলায়তের প্রভাবে ওলীর চরিত্রে বিজদান ও হাল জজবার সৃষ্টি হয়। তিনি তার মাওলার স্মরণে বিভোরচিত্তেতায় মগ্ন হন। যা সাধারণ মুমিনের পক্ষে অকল্পনীয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে ওলীর বেলায়তী বৈশিষ্ট্য হবেক ইলাহি, আখলাকে মোস্তফা (সঃ), কারামাত, কাশফ, ইলহাম, ফিরাছাত, বিজদান, হাল জজবা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে কোরান ও হাদীস শরিফে প্রচুর দলীল ও আলোচনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পরিহারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিষয়ে কোরান থেকে সর্বোচ্চ একটি দলিল ও হাদিস শরীফ থেকে সর্বোচ্চ একটি দলিল আলোচনা করা হয়েছে।

২. বেলায়ত

শব্দগত দিক থেকে 'বেলায়ত' (الولاية) শব্দটির মৌলিক অর্থ কয়েকটি হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে নৈকট্য (القرب)। এই অর্থটি তুলনামূলকভাবে বেশি প্রচলিত। অপরটি হচ্ছে কোন কিছুর দায়িত্ব নেয়া (تولى الأمر)। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে উভয় অর্থেই 'বেলায়ত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একই শব্দমূল থেকে ওলী (ولي) শব্দটি উৎসারিত। মূল আদ্যাক্ষর (و-ل-ى) বহু বচন আওলিয়া (أولياء)।

আরবী ভাষায় আমরা যখন শব্দমূল (و-ل-ى) পর্যালোচনা করি তখন আমরা দেখি যে, প্রথম পর্যায়ে বেলায়তের 'নৈকট্য' এর অর্থই সামনে আসে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রাথমিক অর্থ থেকে অপর দুটি অর্থ জন্ম নেয়। একটি হচ্ছে 'বন্ধুত্ব' (الصدق) এবং অপরটি হচ্ছে শাসনকর্তা, দায়িত্বশীল ও প্রভাবক (الحكم وتولى الأمر والمدبر) এর ভাব। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাবনার সমষ্টিতে পরবর্তিতে যে অর্থের জন্ম নিচ্ছে তা হচ্ছে সাহায্য (النصرة)।

সুতরাং, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাব্দিক বিশ্লেষনে ওলী (ولي) মানে যিনি অতি নিকটজন। তিনি বন্ধু, তিনি দায়িত্বশীল। আবার ইবনুল মনজুরের[৩] ভাষায় তিনি সাহায্যকারি।

ওলী শব্দটির একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুপম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা বান্দার সিফাত হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি এটা আল্লাহর আসমাউল হুসনার অন্যতম। পবিত্র কোরআনে এসেছে, "আল্লাহ ঈমানদারদের ওলী, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান"[৪]। অন্য আয়াতে এসেছে, "আল্লাহ মুমিনদের ওলী"[৫]। এভাবে বেলায়ত পরিণত হয়েছে খালেক ও মাখলুকের সিফাতের মিলনকেন্দ্রে।

[২] ولن تجد لسنة الله تبديلا
[৩] লিসানুল আরব
[৪] বাকারা: ২৫৭
[৫] আলে ইমরান: ৬৮

৩. ওলীর বেলায়তী বৈশিষ্ট্য

বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য ও রেজামন্দি অর্জন করে তখন তার মাঝে সেই নৈকট্য ও ঐশী সন্তুষ্টির ছটা পরিলক্ষিত হয়। সুবাসিত ফুলের সৌরভে যেমন ভ্রমর আকৃষ্ট হয় তেমনি ওলীর মাঝে বিকশিত নৈকট্য ও বন্ধুত্বের ঐশী ফল্গুধারা সৃষ্টিকুলের অগ্নি-আকর্ষিত-পতঙ্গ সম বিভোরতায় আকর্ষণ করে। এই ঐশী করুনাধারার বৈশিষ্ট্যের কিছু জ্ঞাত কিছু অজ্ঞাত। এই স্বর্গীয় নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্বরূপ ও মূলতত্ত্ব বিশ্লেষন দূরহ। এ অধরা। এ অস্পৃশ্য। যার অর্জন হয়নি তার বোধের অগম্য। আর যিনি ছোঁয়া পেয়েছেন তার ব্যক্তের ভাষা লুপ্ত। সহজ ও সারল্যের অবগুন্ঠনে দুর্বোধ্যতার অনন্য অবস্থান। অনুভব-উর্ধ্ব নৈকট্যের তূরীয় বহিঃপ্রকাশ। বর্তমান, আবার ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র বহির্ভূত। ওলীর বেলায়তী গুনের মাঝে সুন্নতে মোস্তফা (সঃ) এর পূর্ণ অনুসরণ, হাল জজবার অধিকারী হওয়া, ছবেক ইলাহির স্বাদ আস্বাদন, কারামাত লাভ করা, কাশফ, ফিরাছাত, ইলহাম প্রভৃতি অর্জন অন্যতম।

৪. উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া

আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে বান্দা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে। শিল্পী যেমন ক্যানভাসে তুলির আঁচড় বসানোর পূর্বে মানস পটে ছবি এঁকে নেন; পথিক যেমন চলার পথে পথের দিগ-নির্দেশিকা স্মৃতিতে গেঁথে নেন, তেমনি চরিত্রকে উন্নত করার জন্যও পূর্ব নির্ধারিত চারিত্রিক মাপকাঠি প্রয়োজন। কারণ, একটি মাত্র জীবন আমাদের। বড় সংক্ষিপ্ত। বড্ড ধাবমান। জীবনের পথ পরিক্রমায় পূণ্য ও সাফল্যের সৌরভ যেমন আমাদের অস্তিত্বকে সুবাসিত ও সহজ করে, তেমনি পাপ ও ব্যর্থতার ফলও ভোগ করতে হয় নিদারুন রূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতায়। এক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন সুযোগ নেই। তাই জীবনে উৎকর্ষতার জন্য-চাই তা হোক জাহেরী বা বাতেনি- প্রয়োজন পরীক্ষিত একটি মাপকাঠি। যার দিগ-নির্দেশনায় পথচারী সময়ের আগেই জানতে পারে জীবন সমুদ্রে তার চলার গতি পথ। দিশা পাবে সরল সোজা পথের। এড়িয়ে চলতে পারবে বিপদসংকুল পথ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসুল (সঃ) এর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"[৬] পবিত্র কোরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসুল (সঃ) কে বড় ভালোবাসায় কাছে টেনে সম্বোধন করে বলছেন, ওগো রাসুল: "আপনি অবশ্যই উন্নত চরিত্রের অধিকারী।"[৭]

সুতরাং রাসুল (সঃ) এর যে চরিত্র তাই সর্বোচ্চ অনুসরনীয় চরিত্র। পবিত্র কোরআনের আদি অন্ত রাসুলের (সঃ) শান ও সিফাত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এই সব গুনগান কখনও মূর্ত কখনও বা বিমূর্ত। তুলনামূলক বিশ্লেষণে পবিত্র কোরআনে রাসুলের (সঃ) আর কোন সিফাত বর্ণনায় বা তার (সঃ) গুনগানে আল্লাহ তায়ালা এত দৃঢ়তায়; এত আদর করে; ভালোবাসায় কাছে টেনে তার প্রিয় হাবীবের (সঃ) গুনগান করেননি। চারিত্রিক গুনের ব্যাপারে রাসুল (সঃ) কে আল্লাহ তায়ালার এই ভালোবাসা মিশ্রিত সম্বোধন; এই সর্বোচ্চ দৃঢ়তাপূর্ণ গুনগানে আমরা মানব জীবনে উন্নত চরিত্রের মহিমা বুঝতে পারি। আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, উন্নত চরিত্রের মাধ্যমেই বান্দার বাহ্যিক উন্নতিতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অন্য এক হাদীসে রাসুল (সঃ) বলেছেন, "মুমিনদের মাঝে পূর্ণ ঈমানদার হচ্ছে সে, যার চরিত্র উত্তম।"[৮]

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, সূফী সাধনা হচ্ছে চরিত্রবান হওয়া। যে তোমার চাইতে বেশি চরিত্রবান, সে সূফী সাধনায়ও তোমার চাইতে অগ্রগামী।[৯]

আল্লাহর বন্ধুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি বন্ধুর বন্ধুকে ভালোবাসবেন ও তার গুনাবলীকে নিজ চরিত্রে ধারন করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহর হাবীব রাসুল (সঃ) এর চারিত্রিক গুনাবলী কে আপন চরিত্রে ধারন করার সফলতার

[৬] সূরা আহযাব, ২১ (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة)
[৭] সূরা কালাম, ৪ (انك لعلى خلق عظيم)
[৮] মুসনাদ আহমদ, আবু হোরায়রা অধ্যায়। (اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا)
[৯] হাকায়েক আন তাসাউফ, পৃ: ২৯২

মাঝেই নিহিত রয়েছে সাধকের রুহানী উৎকর্ষতার চাবিকাঠি। ওলী তার বেলায়ত লাভের পথ পরিক্রমায় আপন চরিত্রকে সংশোধন করে একাধারে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করেন এবং সাথে সাথে পথহারা মানবতার হেদায়তের ঐশী আলোকবর্তিকারূপে আবির্ভূত হয়ে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ ধারকরূপে বিবেচিত হন। এবং হাদীসে[১০] নির্দেশিত আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করেন।

৫. আল্লাহর ভালোবাসা

ভালোবাসা মানে ভালো লাগা। কোন কিছুকে একান্ত করে পেতে চাওয়া। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, খোদা প্রেম সকল মাকামের চূড়ান্ত সীমা এবং সর্বোচ্চ স্তর। কারণ, ভালবাসার মাকামের পর 'শওক', 'উনস', রেযা ইত্যাদি যে মাকামই আসুক না কেন, সবই মুহাব্বতের অনুগামী ও ফল। মুহাব্বতের মাকামের পূর্বে তওবা, সবর, যুহদ ও অন্যান্য যত মাকাম রয়েছে, সবই মুহাব্বাতের প্রারম্ভিকা।[১১]

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে দুই ধরনের ভালবাসার কথা পাওয়া যায়- আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর ভালবাসা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর।"[১২]

রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তির কাছে তিনটি বিষয় থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। (এক) আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (সঃ) তার কাছে সমধিক প্রিয়তর হওয়া। (দুই) কাউকে ভালোবাসলে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা। (তিন) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপছন্দ করে তেমনি কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করবে।[১৩]

এসবই উর্ধমুখী ভালবাসা। বান্দা তার প্রভুকে ভালবাসছে। তার কাছে ভালবাসার উসিলায় রহমত প্রত্যাশা করছে। এসবই আল্লাহর জন্য ভালবাসা।

অপরদিকে অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন, "আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"[১৪] "আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালবাসেন।"[১৫]

এই ভালবাসা নিম্নমুখী। এখানে আল্লাহ তার বান্দাকে পছন্দ করছেন। তাকে ভালবাসছেন। এটাও কিছুটা একতরফা। বান্দা ধৈর্য্য ধরেছে, ইহসান করেছে তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসছেন। তবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রেমময় মাকাম হচ্ছে, বিনিময়ের মাকাম। যে মাকামে উভয় পক্ষেই সমান জিনিস বিনিময় হবে।

সন্তুষ্টি বিনিময় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন, "তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।"[১৬] জিকির বা পারস্পরিক স্মরণ বিনিময় সম্পর্কে বলছেন, "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করবো।"[১৭]

[১০] (تخلقوا باخلاق الله) তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।
[১১] ইহইয়া উলমুদ্দীন, পৃ ২৯৪ খ: ৪
فإن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا وأخواتها ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها
[১২] সূরা বাকারা, ১৬৫ (والذين آمنوا اشد حبا لله)
[১৩] বুখারি, কিতাবুল ঈমান।
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار
[১৪] আলে ইমরান ১৪৬ (والله يحب الصابرين)
[১৫] সূরা মায়েদা, ৯৩ (والله يحب المحسنين)
[১৬] সূরা বাইয়্যেনাহ, ৭

আল্লাহ তায়ালা ভালবাসা বিনিময়ের মাকাম সম্পর্কে বলছেন, "মুমিনগন! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে (তাদের পরিবর্তে) আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনগন- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।"[১৮]

আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর ভালবাসার মাঝে পার্থক্য আছে। হাকীকতের পরিভাষায় বলতে গেলে- আল্লাহ বান্দাকে তার পরিপূর্ণ নেয়ামতের অধিকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত দেখতে চান। তাকে মাকামে ইহসানে উন্নীত হয়ে আপন দীদার লাভে প্রত্যাশী হিসেবে চান। প্রভুর নৈকট্য লাভের পথ পরিক্রমায় উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ সোপানে উন্নীত করতে চান। এটা আল্লাহর কুদরতি এরাদা। একটি সিফাত। কিন্তু ক্ষেত্রে ভিন্নতায় প্রকাশ ভঙ্গিও ভিন্ন। বান্দার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এর প্রকাশ 'অসন্তুষ্টি' এর ভঙ্গিতে। সাধারণ মুমিনের সৎ কার্যের প্রতিদানমূলক নেয়ামতের ক্ষেত্রে এর নাম রহমত। আর তার বিশেষ বন্ধু; নৈকট্যপ্রাপ্ত পুন্যাত্মাদের নৈকট্যের প্রতিশ্রুতিমূলক নেয়ামতের ক্ষেত্রে এর নাম মুহাব্বাত বা ভালোবাসা।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তিনি তার বাছাই করা কিছু বান্দাকে ভালবাসবেন আর তারাও তাদের প্রভুকে ভালবাসবেন। এটা এক মুখী ভালবাসা নয়। বরং পরস্পরমুখী। নিত্যকে অনিত্য ভালবাসছে। অনিত্য নিত্যকে ভালবাসছে। নিত্য ও অনিত্য দুইটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিপরীতধর্মী স্বত্ত্বা। এক স্বত্ত্বা অবিনশ্বর, অন্যটি নশ্বর। এক স্বত্ত্বা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যটি তারই মুখাপেক্ষী। একজন সৃষ্টিকর্তা; মালিক, অপরজন তারই সৃষ্ট; তারই আজ্ঞাধীন। তারপরও এই নিত্য, অবিনশ্বর, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু তারই আজ্ঞাধীন ও মুখাপেক্ষী সৃষ্টিকে ভালবাসেন। কারণ তিনি পরম মমতায় নিজ কুদরতি হাতে[১৯] আপন কুদরতি মশিয়্যতের[২০] ছুরতে[২১] তার রহস্যের ধারক[২২] হিসেবে এই মানব স্বত্ত্বাকে সৃষ্টি করেছেন। তার পবিত্র জাত সম্পর্কিত প্রথম নুর[২৩]- নুরে মুহাম্মদী (সঃ) কে এই মানব স্বত্ত্বার অবয়বে ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। তাই এই অবয়বের অধিকারী স্বত্ত্বা আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ। অপরাপর সৃষ্টি এই সেবায় নিয়োজিত।

আল্লাহর কুদরতি ইচ্ছা তার এই প্রিয় সৃষ্টি তারই দীদার লাভের সাধনায় ব্যাপৃত থাকুক। আপন আত্মাকে সংশোধন ও পরিশোধন পূর্বক জৈবিক আড়াল মুক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হোক। স্রষ্টার প্রতি তার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হোক ইবাদত ও উবুদিয়্যতের মাধ্যমে। কিন্তু মানবতা যখন তার স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্ব ভুলে অবাধ্যতার তিমিরে নিমজ্জিত হয় এবং সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠের শরাফত হারিয়ে ফেলে তখন অসন্তুষ্টি ও শাস্তির আবরনে 'মশিয়তে ইলাহী'র প্রকাশ হয়। আর বান্দা যখন পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে তার প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের পথে অগ্রগামী হয় এবং মাকামে ইহসানের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ লাভ করে তখন আল্লাহ তারই সৃষ্টি-বান্দাকে ভালবাসেন; তারই বন্দনা করেন। তাকে আপন বন্ধুর কাতারে শামিল করেন। ভালবেসে তাকে তার একান্ত নৈকট্যের অধিকারী করেন। এটাই আল্লাহর ভালবাসা। এরই নাম বেলায়ত। এ এমন এক ঐশী ভালবাসার সম্পর্ক যেখানে অন্যদের প্রবেশাধিকারতো দূরের কথা অনুভবেরও সুযোগ নেই। লাহুত ও

[১৭] সূরা বাকারা, ১৫২
[১৮] সূরা মায়েদা, ৫৪
[১৯] আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরতি হাতে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। (সুনান কুবরা, খন্ড: ৯ পৃ: ৯৩
[২০] এরাদা, ইচ্ছা
[২১] (আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ:) তার কুদরতি ছুরতে সৃষ্টি করেছেন। (মুসনাদ আহমদ, পৃ: ৫০৬ খন্ড: ১৩
[২২] (الانسان سري وانا سره)
[২৩] হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা:) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসুল্লাহ (স:) কে বললাম, আমার মা বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক। সবার আগে আল্লাহ তায়ালা যে বস্তু সৃষ্টি তা আমাকে বলুন। তিনি (স:) বলেন, জাবের! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছুর আগে তার নুর থেকে তোমার নবীর নুর সৃষ্টি করেছেন। (শরহুল মাওয়াহেব, জুরকানী)

নাছুতের মাঝে সংযোগস্থল অন্তহীন মহাসাগররূপী বেলায়ত। আর এই বেলায়ত নামী অন্তহীন মহাসাগরকে পূর্ণ করা হয়েছে 'হুব্বে ইলাহী' এর স্বর্গীয় শরাবে। এই প্রসঙ্গে এক মাইজভাণ্ডারী গীতিকার বলেন,

"মাইজভাণ্ডার প্রেমের দরবার প্রেমিক ছাড়া বুঝবে না
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী বসাইছে প্রেমের কারখানা
প্রেমেই সৃষ্টির মূল ফরমাইয়াছেন নবী রসুল
প্রেম বিনে খোদার সনে মিলন কভু হবেনা"

(শানে গাউছে মাইজভাণ্ডার)

এই ঐশী প্রেমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবেসে তার খাছ বন্ধু করে নেন তখন সেই বান্দার মাঝেও ঐশী প্রেমের ছটা পরিলক্ষিত হয়। বান্দাও তখন আল্লাহকে ভালবাসে। বান্দা সকল কিছুর উপর তার বন্ধুর ইচ্ছাকে; বন্ধুর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেন। তাদের এই ভালবাসার কোন কারণ নেই; বিনিময়ের চাহিদা নেই। এই ঐশী প্রেমের অনলে আক্রান্ত অন্তরের কোন চিকিৎসা নেই। এর একমাত্র ঔষধ আল্লাহর ভালবাসা। নিজ হুব্বে ইলাহির পরিবর্তে খোদার হুব্বে ইলাহী ছাড়া আর কিছুতে আসক্ত হননা। হুব্বে ইলাহির মাকামে কাছে জান্নাতের নেয়ামত আর জাহান্নামের ভীতিকেও তুচ্ছ মনে হয়। হযরত রাবেয়া বসরি (রহঃ) বলেন,

সবাই তো আগুনের ভয়ে ইবাদাত করে - নরকাগ্নি থেকে মুক্তিকেই বড় পাওয়া মনে করে
অথবা জান্নাতে থাকার জন্য যাতে - স্বর্গীয় পেয়ালায় সালসাবিলের পানি পান করতে পারে
নয়তো স্বর্গীয় প্রাসাদে থাকার জন্য - আর আমি আমার ভালবাসার কোন বিনিময় চাইনা।[২৪]

৬. কারামাত

বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসলে কাছে টানে। তাকে সম্মানিত করে। আল্লাহ তায়ালাও তার নৈকট্যলাভকারী প্রিয় বন্ধুদের সম্মানিত করেন। তাদের স্বত্ত্বায় এমন অপ্রচলিত বিষয় সন্নিবেশিত করেন যার মাধ্যমে তাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এসব বিষয়ের দ্বারা মানুষ আল্লাহর বন্ধুদের কামালিয়াত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। এবং আল্লাহর বন্ধু তথা ওলীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে খোদা পরিচয় জ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বন্ধুদের যে অলৌকিক ও অপার্থিব বিষয়াদি দ্বারা সম্মানিত করেন তা-ই কারামত।

বর্তমান সময়ে ওলীদের কারামত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের প্লাবন বর্তমানে আমাদের সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সবকিছুতেই সন্দেহবাদিতার বাতিক লেগেছে। এই মানসিক রোগে নাস্তিকতো বটেই অতি ধার্মিক ব্যক্তিরাও মুক্ত নন। যখনই তারা কোন অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেন তখন সন্দেহযুক্ত গলায় বলে বসেন এ কিভাবে সম্ভব? এটা মূলত: তাদের দুর্বল ঈমানের পরিচয় বহন করে। বস্তুতঃ কারামতের বিষয়টি কোরান-হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমানিত। কারামাতের উপর বিশ্বাস আমাদের ঈমানের অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত।

৬.১. আল কোরআনে কারামাত

পবিত্র কোরআনে কারামাত সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রচুর বর্ণনা রয়েছে। কোরআনের উপর বিশ্বাস করা যেমন আবশ্যক তেমনি কোরআনে বর্ণিত এসব কারামত সংশ্লিষ্ট ঘটনার সত্যতার বিষয়েও ঈমান আনা আবশ্যক। নয়তো তা

[২৪]
كلهم يعبدون من خوف نار - ويرون النجاة حظا جزيلا
او لكي يسكنوا الجنان فيحظوا - بالفردوس ويشربوا السلسبيلا
او يقيموا بين القصور جميعا - انا لا ابتغي بحبي بديلا

খণ্ডিত ঈমান হিসেবে পরিগণিত হবে। পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই কারামাত সংশ্লিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। যেমন, হযরত সোলাইমান (আঃ) এর পরিষদের সদস্য হযরত আছেফ বিন বারখিয়া (রহঃ) এর কারামাত[২৫]। তিনি ইয়েমেন থেকে ফিলিস্তিনে বিলকিসের সিংহাসন মুহূর্তেরও কম সময়ের মাঝে নিয়ে আসেন।

৬.২. হাদীস শরীফে কারামাত

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ঘটনা। তার কাছে কিছু মেহমান এসেছিলো। তাদের সামনে পরিবেশিত খানার এত বরকত হয়েছিলো যে, তাদের খাওয়ার পরও খাদ্য প্রায় তিনগুন বেড়ে যায়। এই ঘটনাটি বুখারী শরীফে 'বাবুছ ছামারি মায়া দাইফি ওয়া আহলি' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া হাদীস শরীফে পূর্ববর্তি কাওম ও সাহাবীদের প্রচুর কারামাতের বর্ণনা পাওয়া যায়।

৬.৩. কারামাতের উদ্দেশ্য ও হেকমত

কারামাতের শক্তির মৌলিক উৎস আল্লাহ তায়ালা। তিনি তার প্রিয় বন্ধুদের মাধ্যমে কারামত সংঘটিত করান। ওলীদের মাধ্যমে কারামত সংঘটিত করানোর অনেক হেকমত ও ফায়দা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার ওলীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানুষের মাঝে তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরার জন্য কারামত দান করেন। এছাড়া বিপদে-আপদে, ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলে তাদের সাহায্যার্থে অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়। কারামতের মাধ্যমে মূলতঃ মানুষ আল্লাহ কুদরতের মহিমা প্রকাশ পায়। ওলীদের কারামত দর্শনে আল্লাহর কুদরতের উপর আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। এই বিশ্বজগত একটি বিশেষ নিয়ম-শৃংখলার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে এই নিয়ম-শৃংখলার ব্যতিক্রমও করতে পারেন। আল্লাহর ওলীদের কারামতের মাধ্যমে আল্লাহই যে সর্ব শক্তিমান এই ঈমান দৃঢ় হয়।

৬.৪. সূফীদের দৃষ্টিতে কারামাত

সূফীবাদের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে তাজকিয়াতুন নাফছ বা আত্মার পরিশোধনের দ্বারা নুরে মুহাম্মদী (সঃ) এর সাথে রুহানী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রেযায়ে খোদা অর্জন করা। কারামাত সূফী সাধনার পথে একটি সম্ভাব্য বিষয়মাত্র। কোন ওলীর প্রয়োজনের তাগিদে কারামত প্রকাশ হতে পারে। আবার কোন ওলীর পক্ষ থেকে কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত নাও হতে পারে। কারামত প্রকাশ হলে কোন ওলী বড় আবার কারামত দেখা না গেলে তার বেলায়তের স্তর নিচু শ্রেণীর বা তিনি বেলায়তের অধিকারী নন ইত্যাদি ধারনা করার কোন অবকাশ সূফী পরিমণ্ডলে নেই। এবং কারামতের মাঝে বড়/ছোট ইত্যাদি ভাগ করারও কোন সুযোগ নেই। কারণ কারামাত মূলত: আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রিয় বান্দার প্রতি বিশেষ সম্মাননামূলক নেয়ামত।

সূফীয়ায়ে কেরাম বলেন, একজন ওলীর সবচাইতে বড় কারামাত হচ্ছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পাপকার্য থেকে বিরত থাকতে পারা; সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের মাঝে নিজের প্রতিটি মুহূর্ত কাটানোর সক্ষমতা অর্জন করা। এবং প্রতি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকা। সূফীয়ায়ে কেরাম আরও বলেন যে, কোন ওলীর হাতে প্রকাশিত কারামাত উৎসগতভাবে সেই নবীর মোজেজার অংশ। কেননা ওলামা নবীদের রুহানী উত্তরাধিকারী। নবীদের এই মোজেজা উত্তরাধিকারসূত্রে ওলামা লাভ করেছেন।

৭. কাশফ

কাশফ হচ্ছে এক বিশেষ খোদায়ী নুর যা খোদাপথযাত্রীদের লাভ হয়। বান্দা যখন রিয়াজত ও ইবাদাতের মাধ্যমে তার ক্বালবকে পাপের স্পর্শ মুক্ত করে তখন তার অন্তর খোদায়ী ঝলওয়ার ছটা ধারন করার যোগ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। তিনি স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। যে ব্যক্তি খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে করুনার নুর লাভ করেছেন তার মাঝেও খোদায়ী সিফাত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

[২৫] সূরা নামলের ১৯ আয়াত থেকে ৪৩ আয়াত পর্যন্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

এই নুরের আলোকে অদৃশ্যের পর্দা উন্মোচিত হয়ে ইন্দ্রিয়-আধাঁর দূরিভূত হয়। ঐশী নুরের আলোকে আলোকিত অন্তচক্ষুর দৃষ্টির সীমানায় স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতা বিলুপ্ত। এই নুরের অধিকারী স্বত্ত্বা এই নুরের আলোকে আল্লাহর সৃষ্টি জগত অবলোকন করেন এবং এমন অনেক কিছু দেখেন যা অজ্ঞাত অন্যরা অনুভব করারও সুযোগ পাননা। বাস্তবিকই যার ঈমান দুর্বল; যার অন্তর পাপ ও অবাধ্যতার কালিমায় সিক্ত; যে সংশয়ের জালে আবদ্ধ, সে কিভাবে খোদায়ী নেয়ামতের ধারক হবে?

৭.১. কাশফের হাকীকত

রুহানী সাধনার মাধ্যমে বান্দার 'রুহ' জাহেরী অবস্থা থেকে বাতেনী অবস্থার দিকে ধাবিত হয়। তখন মানুষের জাহেরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষমতা ও কার্যক্ষমতার চেয়ে রুহের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সাধক আর শারীরিক চোখে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। তখন তিনি তার রুহানী দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে খোদার সৃষ্টিজগতকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করেন। এটাই কাশফের হাকীকত। এই কাশফ মূলত: রাসুল (সঃ) এর রুহানী উত্তরাধিকারেরই[২৬] অংশ। হযরত রাসুল (সঃ) এর কাছে কাশফ[২৭] ছিল। তার (সঃ) পরবর্তিতে তার উত্তরাধিকারী সাহাবা- তাবেয়ী-ওলামা-ওলী-সূফীগন এর হিস্যা লাভ করেছেন।

৭.২. আল কোরআনে কাশফ

পবিত্র কোরআনের বর্ণনায়ও এই কাশফ শক্তির বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত খিযির (আঃ) এর সাথে মুসা (আঃ) এর সাক্ষাতের সময় সংঘটিত ঘটনাবলী[২৮] কাশফ শক্তির অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার অন্যতম উৎস। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার বিশ্লেষন করছি। হযরত খিযির (আঃ) জেনেছিলেন যে, ভাঙ্গা দেয়ালের নিচে দুজন ইয়াতিমের গুপ্তধন লুকায়িত আছে। দেয়াল ভেঙ্গে গুপ্তধন বের হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। দুজন ইয়াতিম যেহেতু দুর্বল ছিলো তাই তাদের ধন-সম্পত্তি বেহাত হওয়ার আশংকা ছিলো। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত খিযির (আঃ) স্ব-উদ্যোগে এই ভাঙ্গা দেয়াল মেরামত করে দেন। কোরআনের ভাষ্যানুযায়ী হযরত খিযির (আঃ) কে কেউ জাহেরীভাবে এই বিষয়ে অবগত করেননি। যে বিশেষ খোদায়ী শক্তির বদৌলতে হযরত খিযির (আঃ) এর সামনে দেয়ালের আড়ালে লুকায়িত গুপ্তধনের অবস্থান উন্মোচিত হয়ে ছিলো এবং তাদের মালিকদের বর্তমান অবস্থা (অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতিম) অবগত হয়েছিলো সেটাই কাশফ।

৭.৩. হাদীস শরীফে কাশফ

রাসুল (সঃ) ও সাহাবাদের জীবনে সংঘটিত এমন প্রচুর ঘটনা আছে যাতে কাশফ শক্তির অস্তিত্ব ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রমান পাওয়া যায়। এখানে শুধুমাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

হযরত ওমর (রাঃ) পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানকালে হযরত সারিয়া বিন যুনাইম আল খালযির (রাঃ) নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এটা পারস্য অভিযানকারী মুসলিম সৈন্যদলের একটি অংশ ছিল। তারা নিহাওয়ান্দ শহর অবরোধ করে। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলিম সৈন্যদল প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে। এবং পরাজয়ের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি জুমার খোতবা প্রদান করছিলেন। আচমকা তিনি উঁচু স্বরে বলে উঠলেন, সারিয়া! পাহাড়ের দিকে সরে যাও।" এভাবে তিন বার বলার পর আবার খুতবা দিতে লাগলেন।

[২৬] রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ওলামারা নবীদের উত্তরাধিকারী। (العلماء ورثة الانبياء)
[২৭] হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নামাজের একামাত দেয়া হয়ে গেছে। এই সময় রাসুল (সঃ) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের কাতারকে সোজা কর এবং পরস্পর লেগে লেগে দাড়াও। আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখছি। (বুখারী, কিতাব আবওয়াবুল জামাআহ)। রাসুল (সঃ) এর এই ক্ষমতা ছিল যে তিনি তার পশ্চাতেও সমানভাবে দেখতে পেতেন। এটা তার (সঃ) কাশফ শক্তির প্রমান। এবং এই কাশফ শক্তি রাসুলের পবিত্র হাকিকতে তার মোজেজার অংশ হিসেবে প্রকাশিত।
[২৮] হযরত খিযির ও মুসা (আঃ) এর মাঝে সংঘটিত ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য সূরা কাহফ দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ প্রলম্বিত হওয়ার আশংকায় বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করা হলোনা।

অন্যদিকে নেহাওয়ান্দে যুদ্ধে ব্যস্ত মুসলিম সৈন্যদল ও তাদের সেনাপতি হযরত সারিয়া (রাঃ) এই আওয়াজ শুনলেন। সবাই বলতে লাগলেন এতো আমাদের আমীরুল মুমিনের আওয়াজ। পুরো সৈন্যদল পাহাড়ের দিকে সরে যায়। যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তনের কারনে মুসলিম সৈন্যদল চাপ কাটিয়ে উঠে এবং জয় লাভ করে।

৭.৩.১.

এই ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি জিনিস জানতে পারি।

১. হযরত ওমর (রাঃ) কাশফ শক্তির অধিকারী ছিলেন। এবং এই স্বর্গীয় শক্তি প্রয়োজনের নিরীখে জনসমাগমে প্রকাশ হয়েছিলো। হযরত ওমর (রাঃ) মদীনা শরীফে অবস্থান করে হাজার মাইল দূরে মুসলিম সৈন্যদের অবস্থা, যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগলিক বিবরণ, যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

২. মদীনা শরিফ ও নেহাওয়ান্দ এর মাঝে হাজার মাইলের দুরত্ব সত্ত্বেও হযরত ওমরের (রাঃ) আওয়াজ মুসলিম সৈন্যদলের কানে পৌছে ছিল। এটা ছিল হযরত ওমর (রাঃ) এর কারামত।

৩. মুসলিম সৈন্যদল গায়েব থেকে হযরত ওমর (রাঃ) এর আওয়াজ ও দিক নির্দেশনা শুনে সাথে সাথে তার নির্দেশ গ্রহন করে নিয়েছিলেন। কেউ এ ব্যাপারে এখতেলাফ করেন নি যে, এটা সম্ভব নয় বা জায়েজ নয়। বা কেউ এ ব্যাপারে ফতোয়াও খুঁজতে যাননি। তারা পরস্পরের সাথে এর সত্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনাও করেন নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আওয়াজ শুনার সাথে সাথে তারা এক বাক্যে বলেছিলো এটা আমাদের আমিরুল মুমিনীনের আওয়াজ। তাদের দৃঢ় ঈমান ছিলো যে তাদের আমিরুল মুমিনীন মদীনায় অবস্থান করেও সৈন্যদলের অবস্থা অবলোকনের এবং সেই অনুযায়ী দিক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। এ থেকে আমরা তৎকালীন সাহাবাদের (রাঃ) সমাজ ব্যবস্থা, আকিদা, ঈমান ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারি। সাহাবাদের সমাজ ও ধর্মীয় জীবন এমন ছিলো, যেখানে কাশফ ছিলো, কারামাত ছিলো, ইলহাম ছিলো। এবং তারা এসবে বিশ্বাস করতেন।

৪. হযরত ওমর (রাঃ) নিজের কারামাত জাহের করার জন্য এই কাজ করেন নি। বরং তিনি কাশফ শক্তির ক্ষমতায় সৈন্যদলের অবস্থা অবলোকন করছিলেন। জাহেরীভাবে তিনি মদীনা শরীফে অবস্থান করলেও রুহানীভাবে তিনি তার সৈন্যদলের সাথে ছিলেন। রুহের চোখে তাদের অবস্থা অবলোকনে তিনি (রাঃ) দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এক রেওয়ায়েতে এসেছে,[২৯] হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন কি করবো? আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আমি দেখলাম যে মুসলিম সৈন্যরা পাহাড়ের কাছে যুদ্ধ করছে। শত্রুপক্ষ তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে। এটা দেখে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। তাদের কে বললাম, তোমরা পাহাড়ের দিকে সরে যাও। তারা আমার কথা শুনে পাহাড়ের দিকে সরে গিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে।

কাশফের মাধ্যমে বান্দার সামনে যখন দৃশ্যজগতের অদৃশ্য বিষয় উন্মোচিত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাকে ভাবনাসে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাধানে করার অভিপ্রায়ে তাকে বিশেষ দিক নির্দেশনা দান করেন। সূফী পরিভাষায় এই বিশেষ দিক নির্দেশনাকে ইলহাম বলা হয়।

৮. ইলহাম

৮.১. ইলহামের শাব্দিক অর্থঃ-

ইলহাম (الهام) আরবী শব্দ। শব্দমূল (لهم)। এর অর্থ একবারে কোন কিছু গিলে ফেলা। যেমন বলা হয়, (لهم الماء) এক ঢোকে পানি পান করা।

[২৯] সাওয়ায়েক, পৃ: ২৯৪ খন্ড: ১

ইলহামের শাব্দিক অর্থ কোন কিছু গিলতে দেয়া, গিলিয়ে দেয়া, সামর্থবান করা, পাঠ দান করা, তাওফিক দেয়া। যেমন পবিত্র কোরআনে এসেছে, (ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها)[৩০] শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।" এই আয়াতে ইলহামের অর্থ জ্ঞান দান করা। পৌছানো অর্থেও ইলহাম ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়ঃ (الهمت ذلك الشئ اى ابلغته)

৮.২. ইলহামের পারিভাষিক অর্থ

আল্লাহর তায়ালার পক্ষ থেকে দয়া করে বান্দার অন্তরে যে ইলম- ভাব- ধারনা দান করা হয়, তাকেই সাধারণ ইলহাম হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেমন আল্লামা জুরজানী (রহঃ) বলেন,[৩১] "ফয়েজ হিসেবে অন্তরে যা দান করা হয়।" এবং এটাও বলা হয় থাকে যে, ইলহাম মানে বান্দার অন্তরে যে জ্ঞান দান করা হয়।

৮.৩. আল কোরআনে ইলহাম

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের কে ফোরকান দিবেন; তোমাদের থেকে তোমাদের পাপ সরিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তায়ালা পরম অনুগ্রহশীল।"[৩২]

ইমাম কুশায়রী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে আবশ্যকীয় ইলহাম ও পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করা হয় তাকে ফোরকান বলে। সুতরাং ওলামাদের ফোরকান হচ্ছে, যা তাদের জাহেরী দলিলাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত। আর আরেফীনদের ফোরকান হচ্ছে খোদা-পরিচয় লব্ধ জ্ঞান। ওলামারা তাদের জাহেরী প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের অধিকারী। আর আরেফগন তাদের প্রভুর দয়ার (ইলহাম, কাশফ ইত্যাদি) অধিকারী।[৩৩]

বর্ণিত আয়াতের বিশ্লেষণে আমরা দেখি যে, আয়াতে ফোরকান শব্দের অবগুন্ঠনে 'ইলহাম' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৮.৪. হাদীস শরীফে ইলহাম

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সঃ) বলতেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে কিছু মুহাদ্দাস থাকতো। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ তাদের মধ্যে হয়, তবে ওমর (রাঃ) তাদের একজন।"[৩৪]

এই হাদীস শরীফে উল্লেখিত 'মুহাদ্দাস' শব্দটি আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই শব্দের বিশ্লেষনে হাদীস বিশারদদের ব্যাখ্যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

হযরত ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) বলেন, 'মুহাদ্দাস' এর ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য আছে। অধিকাংশের মতে মুহাদ্দাস মানে মুলহাম (যাকে ইলহাম দেয়া হয়েছে)। তিনি হচ্ছেন এমন ব্যক্তিত্ব যার ধারনা সত্য হয়। তিনি এমন ব্যক্তিত্ব যার অন্তরে উর্দ্ধ জগত থেকে এমন ভাব দান করা হয়েছে যা বাহ্যিকভাবে বলার সমান। কেউ

[৩০] সূরা শামছ, ৭
[৩১] তারিফাত, পৃ ৩০ ما يلقى في الروع بطريق الفيض وقيل الالهام ما وقع في القلب من العلم
[৩২] সূরা আনফাল, ২৯ (يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم)
[৩৩] লাতায়েফুল ইশারাত, পৃ: ৩০৮, খন্ড ২
[৩৪] মুসলিম, বাব মিন ফাদায়েলে ওমর (রা:), (عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قد كان يكون في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي منهم احد فان عمر بن الخطاب منهم)

কেউ বলেছেন মুহাদ্দাস মানে মুকাল্লাম' অর্থাৎ নবুয়তপ্রাপ্ত নন এমন ব্যক্তি যার সাথে ফেরেশতারা কথা বলেন। ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, মুহাদ্দাস মানে যার প্রতি ইলহাম হয়েছে।[৩৫]

৮.৫.

আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন ও হাদীস ইলহামের অস্তিত্বকে অত্যন্ত জোরালোভাবে সমর্থন করেছে। ইলহাম কোন ধরনের জাগতিক প্রচেষ্টা ব্যতিত অর্জিত হয়। মূলতঃ এটা এক ধরনের নেয়ামত। হাদিসে উল্লেখিত মুহাদ্দাস শব্দের ব্যাখ্যায় অনেকেই বলেছেন যাদের সাথে ফেরেশতারা কথা বলেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আওলিয়াদের সাথে ফেরেশতাদের কথা বলার বিষয়টি স্বীকৃত।

ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত সহ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মাঝেও ছিলেন। কোরআন ও হাদিসে 'ইলহাম' বিভিন্ন শব্দের আভরনে আলোচিত হয়েছে। যেমন, ফোরকান, মুহাদ্দাস, ইলমে লাদুন্নি ইত্যাদি।

ইলহাম প্রাপ্তিতে জাগতিক চেষ্টা তদবিরের কোন সংযোগ নেই। তবে ইলহাম প্রাপ্তির যোগ্য হওয়ার জন্য চেষ্টার বিকল্প নেই। সূফী আলেমদের ভাষায় সেই চেষ্টা হচ্ছে- ইবাদত, মুজাহাদা, শরীয়ত পূর্ণভাবে মেনে চলা। আর প্রতিটি চেষ্টা সফল হওয়ার জন্য পরামর্শক ও দিকনির্দেশকের প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতার ময়দানেও সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন একজন মুর্শিদে কামেলের।

ইলহাম লব্ধ জ্ঞান জাহেরী দলিলের মুখাপেক্ষী নয়। তবে কোন ব্যক্তির যদি মনে হয় যে তিনি কোন বিষয়ে ইলহাম প্রাপ্ত হয়েছেন, তবে সে অনুযায়ী আমল করার পূর্বে অবশ্যই পুরো বিষয়কে কোরান ও হাদীসের আলোকে নিরীক্ষা করে নেবেন। এক্ষেত্রে হক্কানী মুর্শিদের দিক নির্দেশনা গ্রহন একান্ত বাঞ্চনীয়।

ইলহাম, কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয় তাকে সুফীয়ায়ে কেরাম ইলমে লাদুন্নি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই ইলমে লাদুন্নি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেহায়ত দান ও দয়া হিসেবে আসে।

৯. ফিরাছাত

ফিরাছাত শব্দের অর্থ গভীরভাবে কোন কিছুর মর্ম উপলব্ধি করা শক্তি, (Scrutiny)।

আল্লামা জুরজানী (রহঃ) বলেন, ফিরাছাত হচ্ছে নিশ্চিতকে জানা ও অদৃশ্যকে দেখা। ফিরাছাত দুই ধরনের হতে পারে।

একঃ আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার ক্বালবে এমন শক্তি দান করেন যাতে তিনি অন্য মানুষের অবস্থা ও তাদের আচার-আচরণের মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার প্রিয় বান্দার প্রতি এক প্রকারের সম্মান বা কারামত। এটা কাশফ শক্তির ক্ষুদ্রাংশ। কোরআন ও হাদিসে এই প্রকারের ফিরাছাতের কথাই আলোচনা করা হয়েছে।

দুইঃ কোন কোন ব্যক্তি তাদের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত শিক্ষার ফলে অন্য মানুষের হাল-হাকিকত উপলব্ধি করতে পারে। এটাও এক প্রকারের ফিরাছাত।

৯.১. আল কোরআনে ফিরাছাত

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, নিশ্চয় এতে মুতাওয়াছছিমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৩৬] এই আয়াতের মাঝে উল্লেখিত 'মুতাওয়াছছিমিন' শব্দের তাফসীরে ইমাম কুরতুবি (রহঃ) বলেন, মুতওয়াছছিম মানে মুতাফাররিছ বা ফিরাছাত সম্পন্ন ব্যক্তি।

[৩৫] ফাতহুল বারী, পৃ: ৫০ খন্ড: ৭

৯.২. হাদীস শরীফে ফিরাছাত

আল্লাহর রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন, তোমরা মুমিনের ফিরাছাত কে পরহেয করো। কেননা সে খোদায়ী নুরে অবলোকন করে।[৩৭]

এই হাদীস শরীফের মর্মানুযায়ী, বান্দার অন্তরে খোদায়ী নুরের যে দ্যুতির প্রতিফলন হয় তার আলোতেই আল্লাহর ওলী মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের আবরণ ভেদ করে তার ভিতরগত জিনিস উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) ওলীর ফিরাছাত শক্তিকে তার মারেফতের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একবার তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো আরেফ বিল্লাহ কে? তিনি বলেন, তুমি চুপ করে থাকলেও যে তোমার অন্তরের খবর বলে দিতে পারে তিনিই খোদা-পরিচয় জ্ঞানের অধিকারী।

৯.৩.

ফিরাছাতের উৎস আল্লাহর দয়া এবং আল্লাহর সাথে বান্দার রুহের আযলি সম্পর্ক। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, "অতঃপর যখন তাকে (আদম আঃ) ঠিকঠাক করে নেব, এবং আমার রুহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেও।"[৩৮]

ওলীয়ে কামেলের রুহ যখন রুহানী জগতে বিচরণ করে তখন সেই রুহ অদৃশ্য জগতস্থ উর্দ্ধ জগতের বিভিন্ন রহস্যাবলী অবলোকন করে। যার মাঝে মানুষের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলীও রয়েছে। তারা যা বলেন তা মূলতঃ ধারনা বা আন্দাজ করে নয় বরং আল্লাহর সৃষ্টি জগতের রহস্যাবলী অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করেই বলেন। আল্লাহর ওলীদের এমন প্রচুর ঘটনা দেখা যায় যেখানে তাদের ফিরাছাত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত খাইরুন নাচ্ছাজ (রহঃ) বলেন, আমি আমার ঘরে বসা ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) দরজায় এসেছেন। প্রথমবার আমি এটা মন থেকে ফেলে দিলাম। এরপর দ্বিতীয়বার মনে হলো। এরপর তৃতীয় বার মনে হলো তিনি আমার ঘরের দরজার সামনে এসেছেন। তখন আমি বের হয়ে দেখলাম হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত জুনাইদ (রহঃ) বলে উঠলেন, প্রথমবার যখন তোমার মনে হলো আমি এসেছি তখন বের হওনি কেন?[৩৯]

১০. বিজদান বা হাল জজবা

বিজদান (وجدان) শব্দের শাব্দিক অর্থ পাওয়া, ভালবাসা, আবেগ ও আকর্ষনের মিশ্র অনুভূতি।

সূফীদের পরিভাষায় ওয়াজদ বলা হয়, বান্দা সাধনা সম্পর্কিত কোন কিছু শোনা বা অবলোকনের পর তার মাঝে শারীরিক যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাকেই ওয়াজদ বলা হয়। সাধারণতঃ প্রচলিত ধারনা যে, শুধুমাত্র ছেমা বা আধ্যাত্ম সংগীত শুনলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাই ওয়াজদ। এবং ওয়াজদ মানেই শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেসামাল নড়াচড়া।

এই ধারনা খণ্ডিত ধারনা। মুলত ওয়াজদ বা বিজদানের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। এই কারনেই হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) সাধকের এই বিশেষ অবস্থা বোঝাতে 'বিজদান' (وجدان) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ওয়াজদ ও 'বিজদান' শব্দদ্বয় অর্থগতভাবে কিছুটা কাছাকাছি হলেও 'বিজদান' এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র ও অর্থ তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ও বিস্তৃত। ছেমা শ্রবনে যেমন ওয়াজদ হতে পারে তেমনি পবিত্র কোরআনের আয়াত, হাদীস তেলাওয়াত ও শ্রবণেও ওয়াজদ হতে পারে। ওয়াজদ শুধুমাত্র ভাব-বিভোরচিত্তে শরীর

[৩৬] সূরা হিজর, ৭৫, (ان في ذلك لايات للمتوسمين)
[৩৭] তিরমিযি, কিতাব তাফসির। (اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله)
[৩৮] সূরা হিজর, ২৯
[৩৯] রিসালাহ কুশাইরিয়া, পৃ: ১১০

দোলানোর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অশ্রুপাত, শরীরের শিহরণ, অন্তরের প্রশান্তিময় অবস্থা, এতমিনান, হৃদয়ে কম্পনময় অবস্থার সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদিও ওয়াজদের অন্তর্ভুক্ত।

১০.১. আল কোরআনে ওয়াজদ এর বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "জেনে রাখ আল্লাহর জিকির এর দ্বারাই অন্তরসমূহ এতমিনান (প্রশান্তিময় অনুভূতি) লাভ করে।"[৪০]

"আল্লাহ উত্তম বাণী নাযিল করেছেন। যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুন: পুন: পঠিত। যারা তাদের পালন কর্তাকে ভয় করে এতে তাদের লোম কাটা দিয়ে উঠে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়।[৪১] যারা ঈমানদার তারাতো এমন যে, যখন আল্লাহর যিকির করা হয় তখন তাদের হৃদ-কম্পন শুরু হয়ে যায়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। এবং তারা তাদের পরওয়ার দেগারের প্রতি ভরসা পোষন করে।"[৪২]

বর্ণিত আয়াত সমূহের উল্লেখিত এতমিনান, শরীর শিহরিত হওয়া, বিনম্র হওয়া, হৃদয়ে প্রশান্তিময় অবস্থা, হৃদ-কম্পন হওয়া ইত্যাদি অবস্থা বিজদান বা হাল ওয়াজদ এর অন্তর্ভুক্ত।

১০.২. হাদীস শরীফে বিজদান বা ওয়াজদ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসুল (সঃ) এর কাছে সূরা নিসা তেলাওয়াত করছিলেন, যখন তিনি এই আয়াতে ("আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মত থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারী রূপে।")[৪৩] পৌছালেন তখন রাসুল (সঃ) বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। তার (সঃ) দু চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিলো।[৪৪] অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার একজনকে কোরআনের আয়াত (ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع) তেলাওয়াত করতে শুনলেন। ওমর (রাঃ) এই আয়াত শুনে চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং হুশ হারিয়ে পড়ে যান।[৪৫]

ছেমার মাহফিলে সাধারণতঃ যে সাধন সংগীত গাওয়া হয় তা মূলতঃ কোরান ও হাদীসের নির্যাস। এসব শ্রবণে খোদা প্রেমিকের রুহে খোদায়ী নুরের যে দোলা লাগে তারই প্রভাব পড়ে তার বাহ্যিক আচার-আচরণে। এই দৈব প্রভাব কখনও কান্না, কখনও হাসি, কখনও প্রশান্ত অবস্থা, কখনও চিৎকার, কখনও বেহুশ হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আর কখনও কোন আলামতই প্রকাশ পায় না। সাধক সবকিছুকেই তার আপন স্বত্তার মাঝে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। কারণ প্রভুর গোপন রহস্য গোপন থাকাই উত্তম।

১১. উপসংহার

বান্দার কালব যখন পরিশুদ্ধ হয়; দুনিয়াবী মোহ ও আকর্ষণ থেকে মুক্তি লাভ করে; তখন তার স্বত্ত্বা রুহানী উৎকর্ষতার দিকে ধাবিত হয়। তিনি সর্বদা তার প্রভুর স্মরণে নিজকে ব্যাপৃত রাখেন। এবং এর প্রতিদানে আল্লাহ তায়ালাও তাকে সর্বদা আপন স্মরণের মধ্যে রাখেন। তিনি আল্লাহর সকল বিধান ও হুকুমে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে সন্তুষ্টি ও তাছলিম প্রকাশ করেন আর আল্লাহ তায়ালা তার এই ঈমানী সন্তুষ্টির বিনিময় স্বরূপ বান্দার প্রতি আপন কুদরতি সন্তুষ্টির করুণাধারা প্রবাহিত করেন।

[৪০] সূরা রাদ, ২৮ (الا بذكر الله تطمئن القلوب)
[৪১] সূরা জুমার, ২৩ (الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله)
[৪২] সূরা আনফাল, ২, (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم)
[৪৩] সূরা নিসা, ৪১ (فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)
[৪৪] বুখারী।
[৪৫] এহইয়া উলুমুদ্দীন ৪ খন্ড, ১৪৫ পৃ:

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও স্মরণ-রূপ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে সাধক আল্লাহকে ভালবাসেন; আল্লাহর জন্য ভালবাসেন; আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসেন। প্রতিদানের চাহিদা বিহীন নাছুতি ভালবাসায় খুশী হয়ে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তার আযলী লাহুতী ভালবাসায় সিক্ত করেন। তাকে আপন বেলায়ত দান করে কাছে টেনে নেন। তাকে আপন বন্ধুর কাতারে শামিল করেন। আল্লাহর জন্য ভালবাসা আর আল্লাহর ভালবাসার এই দ্বৈত ঐশী করুনাধারার সঙ্গম স্থলে পরিণত হয়ে বান্দার স্বত্ত্বাতে খোদায়ী ঝলওয়ার বিচ্ছুরণ ঘটে।

খোদায়ী ঝলওয়ার ধারক ও প্রকাশস্থল হওয়ার মর্যাদায় সিক্ত আল্লাহর ওলী দৃশ্যমান নাছুতী জগতের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে অদৃশ্য জগতস্থ উর্দ্ধ জগতের সিফাত বা বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশিত হয়। তিনি প্রভুর দরবারে সম্মানিত; তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে কারামাত দান করেন। বন্ধুর সম্মানে আল্লাহ তায়ালা মাঝে মাঝে তার সৃষ্টি জগতের প্রাত্যহিক রীতি ও পদ্ধতিকে স্থগিত করে দেন। তখন উত্তপ্ত আগুন[৪৬] আনন্দদায়ক শীতলতার যোগান দেয়। পুকুরে নিক্ষিপ্ত বদনা জগতের সমস্ত সূত্রকে উল্টে দিয়ে স্থান ও সময়ের গণ্ডি ভেদ করে বহু দূরের বাঘের মাথায় আঘাত করে।[৪৭]

বন্ধুর সম্মানে আল্লাহ তায়ালা তার দৃষ্টির নাছুতি পর্দা উন্মোচিত করে দেন। তিনি কাশফ শক্তির অধিকারী হন। তিনি তখন দৈহিক চক্ষুর আভরণে রুহানী দৃষ্টি শক্তির মাধ্যমে আপন প্রভুর সৃষ্টি জগতের রহস্যাবলী অবলোকন করেন। উর্দ্ধ জগতের রহস্যাবলী পর্যবেক্ষণের কারণে আল্লাহর ওলীর সাথে উর্দ্ধ জগতের স্থায়ী সম্পর্ক সূচিত হয়। তার কাছে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা আসে। তিনি ইলহাম প্রাপ্ত হন। ইলহামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ইলমে লাদুন্নি।

ইলমে লাদুন্নির বরকতে আল্লাহর ওলী নিজে যেমন সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত হন তেমনি অন্যরাও তার হেদায়তের আলোকে সঠিক পথের দিশা পায়। আল্লাহর ভালবাসাতে নিজেকে বিলীন করে ওলী তার প্রভুর বিশেষ নেয়ামত প্রাপ্ত হন। তিনি বিজদান, ওয়াজদ প্রাপ্ত হন। তিনি তার প্রভুর স্মরণে মগ্নতার মাঝে আনন্দ খুঁজে পান। আপন অস্তিত্বে প্রকাশিত প্রভুর ঝলওয়ার বিচ্ছুরণের প্রতি মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার মাঝে তৃপ্তি পান।

হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এই মাকামের প্রতি দিক নির্দেশ দিয়ে বলেন,

"তুমি আমার আমি তোমার সর্বস্থানে জেনেছি
তাই বুঝি তুমি ছাড়া অন্য হাস্তি বিনাশী"

সমাপ্ত

[৪৬] হযরত ইবরাহিম (আ:) এর ঘটনা।
[৪৭] হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক বদনা নিক্ষেপ করে ভক্ত উদ্ধারের ঘটনা।

গ্রন্থসূত্র

আবদুল ওহাব শারানী, রদউল ফোকারা আন দাওয়া বেলায়তেল কোবরা, দার জাওয়ামিউল কালিম, মিসর।

আবু নাঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আওলিয়া, দারুল কুতুবুল আরাবী, বৈরুত, ২০০৬।

আবু আবদুর রহমান আহমদ বিন শোয়াইব, সুনান কুবরা, মুআছছাছা রিসালাহ, বৈরুত, ২০০১।

আবদুর রহমান বাদাবি, শাতাহাত ছুফিয়্যাহ, ওকালাতুল মাতবুআত, কুয়েত, ২০০১।

আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ, আসসাওয়ায়েকুল মুহরিকা আলা আহলের রাফদে ওয়া দালাল ওয়া যানদাকাহ, মুয়াছছাছা রিছালাহ, লেবানন, ১৯৯৭।

আবু হামেদ গাজ্জালী, ইহইয়া উলুমিদ্দিন, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৯৯৮।

আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, মুআছছাছাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০০১

আলি বিন উসমান আল জুল্লাবী আল হুজবিরি, কাশফুল মাহজুব, অনু: ড: ইছআদ আবদুল হাদী কিনদিল, মাজলিস আলা লিশ শুউনিল ইসলামিয়া, মিসর, ১৯৭৪।

আলী শুদ কিফিতশ , আল বেলায়াত ওয়ান্নাবুয়্যাহ ইনদা ইবনে আরাবী, দারুশ শুরুক, মিসর, ২০০৪।

আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী শরহে সাহিহিল বুখারী, দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি।

ঈসা আবদুল কাদের, *হাকায়েক আন তাসাউফ*, দারুল ইরফান, হালব (সিরিয়া), ১৯৯৩।

নাজম উদ্দীন কোবরা, ফাওয়ায়েহুল জামাল ওয়া ফাওয়াতেহুল জালাল, দার ছুয়াদ ছাবাহ, কায়রো, ১৯৯৩।

মহি উদ্দীন ইবনুল আরাবী, ফছুছুল হেকম, দারুল কুতুবুল আরাবী, বৈরুত।

ইবনুল আরাবী , তাজাল্লিয়াত আল ইলাহিয়্যা, মারকাজ নশরে দানশগাহী, তেহরান, ১৯৮৮।

ইবনুল আরাবী, আল ফাতুহাত আল মাক্কিয়্যাহ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০২।

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, *সাহীহ মুসলিম*, দার ইহইয়া তুরাছ আল আরবী, বৈরুত (লেবানন) ২০০১।

মুহাম্মদ জাকি ইবরাহিম, উসুলুল উসুল, দার নোবার, মিসর, ২০০৫।

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, সাহিহ বুখারী, দার তুকুন নাজাহ, কায়রো, ১৪২২ হিজরি।

মুহাম্মদ বিন ঈসা, *সুনান তিরমীযি*, মাকতাবাতু মুস্তাফা আল হালাবী, কায়রো, ১৯৯৮।

যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ আল আনসারি, *নাতায়েজুল আফকার আল কুদছিয়্যা*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত ২০০০।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম ১৯৬৭।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *বেলায়তে মোতলাকা*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৯৭৪।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, পঞ্চম সংস্করণ, চট্টগ্রাম ২০১১।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *মানব সভ্যতা*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮।